بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৩ এপ্রিল, ২০২১ মোতাবেক ২৩ শাহাদাত, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ আমি হযরত হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র স্মৃতিচারণ করব। হযরত উমর (রা.) বনু আদি বিন কাব বিন লুঈ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল খাত্তাব বিন নুফায়েল। এক উক্তি অনুসারে তার মায়ের নাম ছিল হানতুমা বিনতে হাশেম, এদিক থেকে তার মাতা আবু জাহলের চাচাতো বোন হন। আর দ্বিতীয় বর্ণনামতে তার মায়ের নাম ছিল হানতুমা বিনতে হিশাম, এ দৃষ্টিকোন থেকে তিনি আবু জাহলের (আপন) বোন হন। কিন্তু বোন হওয়ার এই রেওয়ায়েত খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়। আবু উমর (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি বলে যে, (তিনি) আবু জাহলের বোন ছিলেন, সে ভুল করেছে, যদি তা-ই হতো তাহলে (ইনি) আবু জাহল ও হারেসের বোন হতো, অথচ বাস্তবতা এমন নয়। তিনি তাদের উভয়ের চাচার মেয়ে ছিলেন। তার পিতার নাম হলো হাশেম। হযরত উমরের জন্মের সন সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো অনুসারে হযরত উমরের জন্মগ্রহণের সাল পৃথক পৃথক দাঁড়ায়। অতএব একটি মত হলো, হযরত উমর ফুজ্জারের বড় যুদ্ধের চার বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অথচ অপর স্থানে লিখিত আছে, ফুজ্জারের বড় যুদ্ধের চার বছর পর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই লড়াই নিষিদ্ধ মাসে বা পবিত্র মাসে হয়েছে বলে এটিকে ফুজ্জারের যুদ্ধ বলা হয় যা বড়ই পাপের কারণ ছিল। এই যুদ্ধ চারটি স্তরে হয়েছিল। চতুর্থ যুদ্ধকে **'আল ফুজ্জারুল আযম'** অর্থাৎ ফুজ্জারের বড় যুদ্ধ ছাড়াও **'আল ফুজ্জারুল আযমুল আখের'** অর্থাৎ ফুজ্জারের শেষ বড় যুদ্ধ-ও বলা হয়। এটি কুরাইশ এবং বনু কেনানা ও হাওয়াযেন গোত্রের মাঝে হয়েছিল। অপর একটি মত হলো, হযরত উমর (রা.) হস্তী বাহিনীর আক্রমণের ১৩ বছর পর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হস্তী বাহিনীর আক্রমণ হয়েছিল ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে আর এ হিসাব অনুযায়ী হযরত উমর (রা.)'র জন্ম হয়েছে ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে। তৃতীয় মত হলো, হযরত উমর নবুওয়্যতের ষষ্ঠ বছর ইসলাম গ্রহণ করেন আর তখন তাঁর বয়স ছিল ২৬ বছর। খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী নবুওয়্যতের ষষ্ঠ বছর হলো, ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দ। যদি তখন হযরত উমর (রা.) ২৬ বছর বয়সের হয়ে থাকেন তাহলে তার জন্মের সাল দাঁড়ায় ৫৯০ খ্রিষ্টাব্দ। চতুর্থ মত হলো, হযরত উমর তখন জন্মগ্রহণ করেন যখন মহানবী (সা.)-এর বয়স ছিল ২১ বছর। যাহোক, এগুলো হলো বিভিন্ন মত। প্রায় ২১ বছর থেকে ২৬ বছরের মাঝামাঝি বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত উমর (রা.)'র ডাকনাম ছিল আবু হাফস্। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন নিজ সাহাবীদের বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, বনু হাশেম এবং আরো কিছু লোক বাধ্য হয়ে কুরাইশদের সাথে এসেছে। তারা আমাদের সাথে লড়াই করতে চায় না। অতএব, তোমাদের কেউ বনু হাশেম গোত্রের কারো মুখোমুখি হলে সে যেন তাকে হত্যা না করে। আর যে আবুল বাখতারী'র মুখোমুখি হয়, সে যেন তাকে হত্যা না করে। আর যে

মহানবী (সা.)-এর চাচা, আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব এর মুখোমুখি হয়, সে যেন তাকেও হত্যা না করে; কেননা তারা বাধ্য হয়ে কুরাইশদের সাথে এসেছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু হুযায়ফা বিন উতবাহ্ (রা.) বলেন, আমরা আমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করব আর আব্বাসকে ছেড়ে দিব! খোদার কসম! আমি যদি তার অর্থাৎ আব্বাসের মুখোমুখি হই, তাহলে আমি অবশ্যই তরবারি দিয়ে তাকে হত্যা করব। বর্ণনাকারী বলেন, এই সংবাদ মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি হযরত উমর বিন খাত্তাবকে বলেন, হে আবু হাফস্! হযরত উমর বলেন, খোদার কসম! এই প্রথমবার যখন কিনা মহানবী (সা.) আমাকে আবু হাফস্ উপনামে সম্বোধন করেছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র রসূলের চাচার মুখে কি তরবারি দিয়ে আঘাত করা হবে হবে? হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে অনুমতি দিন, যে একথা বলেছে আমি তরবারি দ্বারা তার শিরোচ্ছেদ করব। আল্লাহ্‌র কসম! সে, অর্থাৎ আবু হুযায়ফাহ্, কপটতা প্রদর্শন করেছে। হযরত আবু হুযায়ফাহ্ পরবর্তীতে বলতেন যে, সেদিন আমি যে কথা বলেছিলাম, তার কারণে আমি স্বস্তিতে ছিলাম না, আর সর্বদা এ কারণে ভয়ের মাঝে থাকতাম। কেবলমাত্র শাহাদতই আমার এ কথার কাফ্‌ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত হতে পারতো অতএব ইয়ামামার যুদ্ধের দিন হযরত আবু হুযায়ফা (রা.) শাহাদত বরণ করেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে ফারুক উপাধি দিয়েছিলেন। এই উপাধি (প্রদানের) প্রেক্ষাপট কী ছিল, এ সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা হলো, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত উমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করি যে, আপনাকে কীভাবে ফারুক উপাধি দেওয়া হলো? তিনি বলেন, হযরত হামযা (রা.) আমার তিনদিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ঘটনাক্রমে আমি মসজিদে হারামের দিকে যাই। তখন আবু জাহল গালি দিতে দিতে ত্বরিৎ মহানবী (সা.)-এর কাছে যায়। এরপর হযরত হামযা (রা.) যা করেছিলেন (তিনি) তা সবিস্তারে বর্ণনা করেন, অর্থাৎ হযরত হামযা (রা.) যখন জানতে পারেন {আবু জাহল মহানবী (সা.)-কে অসম্মান করেছে} তখন তিনি নিজের ধনুক নিয়ে কাবা গৃহের উদ্দেশ্যে যান আর কুরাইশদের সেই আসর, যাতে আবু জাহল বসেছিল, সেখানে গিয়ে তার সামনে নিজের ধনুকে ভর দিয়ে দাঁড়ান এবং ক্রোধভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। আবু জাহল তাঁর চেহারায় অসন্তোষ দেখতে পেয়ে তাকে বলে, হে আবু আম্মারা! {এটি হযরত হামযা (রা.)'র ডাকনাম ছিল} কি হয়েছে? একথা শোনামাত্রই হযরত হামযা (রা.) নিজের ধনুক দিয়ে তার গালে সজোরে আঘাত করেন, যার ফলে তা কেটে যায় এবং সেখান থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। তাঁর ক্রোধের ভয়ে কুরাইশরা দ্রুত বিবাদ মিটিয়ে দেয়। হযরত উমর (রা.) উক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন যে, এটি এভাবে ঘটেছে, যা আমিও দেখেছি। এই ঘটনার তৃতীয় দিন আমি বাহিরে বের হলে পথিমধ্যে বনু মাখযুম গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কি তোমার পিতৃপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করে মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্ম গ্রহণ করেছ? সে বলে, আমি যদি গ্রহণ করে থাকি তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? সেও তো করেছে যার ওপর আমার চেয়ে তোমার বেশি অধিকার রয়েছে। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি বললাম, সে কে? সে বলে, তোমার বোন ও ভগ্নিপতি। একথা শুনে আমি আমার বোনের বাড়িতে গেলে তাদের দরজা বন্ধ দেখতে পাই আর সেখানে আমি ক্ষীণকণ্ঠে কিছু পাঠ করার শব্দ শুনতে পাই। দরজা খুলে দেওয়া হলে আমি ভেতরে প্রবেশ করি আর তাদেরকে বলি, আমি তোমাদের কাছ থেকে এটি কি শুনলাম। তারা জিজ্ঞেস

করে, তুমি কি শুনেছ? এ বাক্য বিনিময়ে (এক পর্যায়ে) বিবাদ শুরু হয়ে যায় আর আমি ভগ্নিপতির মাথা ধরে ফেলি এবং প্রহারে তাকে রক্তাক্ত করে দেই। আমার বোন উঠে দাঁড়ায় এবং সে আমার মাথা ধরে বলে, এটি তোমার ইচ্ছা পরিপন্থী হয়েছে, অর্থাৎ আমাদের ইসলাম গ্রহণ তোমার ইচ্ছা বহির্ভূত! যাহোক, অন্য বর্ণনায় বোনের আহত হওয়ার কথাও উল্লেখ রয়েছে। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি যখন ভগ্নিপতির রক্ত দেখি, আর হতে পারে বোনেরও রক্ত ঝরে থাকবে– তখন আমি লজ্জিত হই এবং বসে পড়ি আর বলি, (তোমরা যা পড়ছিলে) আমাকে সেই গ্রন্থটি দেখাও। আমার বোন বলে, কেবল পবিত্র লোকেরাই তা স্পর্শ করতে পারে, যদি সত্যিই দেখতে চাও তাহলে যাও এবং গোসল করে আসো। অতএব আমি গোসল করে এসে বসে পড়ি। তখন তারা সেই সহীফাটি আমার জন্য বের করে। তাতে (লেখা) ছিল, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ। আমি বললাম, এই নাম তো অত্যন্ত পবিত্র। এরপর ছিল, طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى থেকে আরম্ভ করে لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى পর্যন্ত, অর্থাৎ সূরা ত্বাহা'র ২ থেকে ৯ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত। তিনি (রা.) বলেন, আমার হৃদয়ে এ বাণী গভীরভাবে রেখাপাত করে বা এর প্রভাব সৃষ্টি হয়। আমি বললাম, কুরাইশরা এটিকে এড়িয়ে চলে? আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং বললাম, মহানবী (সা.) কোথায়? আমার বোন বলল, তিনি দ্বারে আরকামে আছেন। আমি সেখানে পৌঁছে দরজায় কড়া নাড়তেই সেখানে উপস্থিত সাহাবীগণ একত্রিত হয়ে যান। হযরত হামযা (রা.) তাদেরকে বলেন, তোমাদের কী হয়েছে? তারা বলল, উমর (এসেছে)। হযরত হামযা বলেন, হোক সে উমর, তার জন্য দরজা খুলে দাও, কেননা সে বাইরে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। যদি সে সদিচ্ছা নিয়ে এসে থাকে তাহলে আমরা তাকে স্বাগত জানাব, আর সে যদি মন্দ উদ্দেশ্যে এসে থাকে তাহলে আমরা তাকে হত্যা করব। এসব কথা মহানবী (সা.)ও শুনতে পান। তিনি বাইরে বেরিয়ে আসলে হযরত উমর (রা.) কলেমা শাহাদাত পাঠ করেন। এতে সেই বাড়িতে উপস্থিত সকল সাহাবী উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চকিত করেন, যা মক্কাবাসীরাও শুনতে পায়। হযরত উমর (রা.) বলেন আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নই? তিনি (সা.) বলেন, কেন নয়? আমি বললাম, তাহলে এই গোপনীয়তা কেন? আমরা আমাদের ধর্মকে কেন লুকিয়ে রাখি? এরপর আমরা সেখান থেকে দুই সারিতে বের হই। একটি সারিতে ছিলাম আমি আর অন্য সারিতে ছিলেন হযরত হামযা। এক পর্যায়ে আমরা মসজিদে হারামে প্রবেশ করি। তখন কুরাইশরা আমাকে এবং হামযাকে দেখে এতটা দুঃখ ও কষ্ট পায় যেরূপ কষ্ট তারা ইতিপূর্বে কখনো পায়নি। অতএব সেদিন মহানবী (সা.) আমার নাম **'ফারুক'** রাখেন, কেননা (সেদিন) ইসলাম শক্তি লাভ করে আর সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। আইয়ূব বিন মূসা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা উমরের মুখ ও হৃদয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন এবং সে ফারুক, কেননা আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন।

হযরত উমর (রা.) দীর্ঘকায় ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। তার মাথার সামনের দিকে চুল ছিল না। গায়ের রং লালচে এবং ঘন গোঁফ ছিল, যার দুই পাশে লাল আভা দেখা যেত। আর তাঁর কপোল ছিল পাতলা গড়নের। অজ্ঞতার যুগে হযরত উমরের প্রিয় হবি বা শখ ছিল অশ্বারোহণ এবং কুস্তি। ওক্কাযের মেলায় প্রতি বছর কুস্তি প্রতিযোগিতায় সাধারণত হযরত উমরই জয় লাভ করতেন। যুবক বয়সে আরবের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তিনি তাঁর পিতার উট চরাতেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আরবে লেখাপড়ার বিষয়টি খুবই দুর্লভ ছিল। সুতরাং মহানবী (সা.) যখন আবির্ভূত

হন, তখন কুরাইশ গোত্রের কেবলমাত্র সতের ব্যক্তি এমন ছিল যারা লিখতে পারত। হযরত উমর (রা.) সেই সময় পড়ালেখা শিখেছিলেন। হযরত উমর (রা.) কুরাইশদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কুরাইশদের দূতের পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। কুরাইশদের এই রীতি ছিল যে, যখন তাদের পরস্পরের মাঝে অথবা তাদের ও অন্যদের মাঝে কোন যুদ্ধ হতো তখন তারা হযরত উমর (রা.)-কে দূত হিসেবে প্রেরণ করত।

যখন আবিসিনিয়া অভিমুখে কতিপয় মুসলমান হিজরত করেছিলেন তখন যারা হযরত উমরের পরিচিত ছিল তাদেরকে হিজরত করতে দেখে, যদিও তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি এবং কঠোর প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন, তাসত্ত্বেও হযরত উমরের প্রতিক্রিয়া ছিল একান্ত মর্মস্পর্শী। এ সম্পর্কে হযরত উম্মে আব্দুল্লাহ্ বিনতে আবু হাসমা (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা যখন আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছিলাম আর আমার স্বামী আমের বিন রবীআ কোন কাজে (বাহিরে) গিয়েছিলেন, তখনই হযরত উমর বিন খাত্তাব আসেন এবং আমার পাশে এসে দাঁড়ান। তখনও তিনি তার শিরকে-ই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং আমাদেরকে তার পক্ষ থেকে নানা ধরনের কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করতে হতো। তিনি বর্ণনা করেন, তিনি আমাকে বলেন, হে উম্মে আব্দুল্লাহ্, মনে হচ্ছে কোথাও রওয়ানা হতে যাচ্ছ? তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র এই পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়ব। যাচ্ছি কোথাও, খুঁজে দেখি কোথায় যাওয়া যায়, আল্লাহ্‌র পৃথিবী অনেক বিস্তৃত। তোমরা আমাদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছ আর আমাদের ওপর অনেক অত্যাচার করেছ, এখন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পরিত্রাণের পথ খুলে দিয়েছেন। উম্মে আব্দুল্লাহ্ বলেন, তিনি (অর্থাৎ উমর) বলেন, আল্লাহ্ তোমাদের সহায় হোন। উম্মে আব্দুল্লাহ্ বলেন, আমি সেই মুহূর্তে তাঁকে যেভাবে আবেগপ্রবণ হতে দেখেছি, পূর্বে কখনো এমনটি দেখি নি। এরপর তিনি চলে যান। আমার ধারণা, আমাদের চলে যাওয়ার ধারণা তাঁকে দুঃখভারাক্রান্ত করে দিয়েছিল। উম্মে আব্দুল্লাহ্ বলেন, আমের বিন রবীআহ্ যখন নিজের কাজ শেষে ফেরত আসেন, তখন আমি তাকে বললাম, হে আব্দুল্লাহ্! হায় যদি তুমি উমরের অবস্থা দেখতে আর আমাদের জন্য তার আবেগপ্রবণ হওয়া এবং দুঃখভারাক্রান্ত হওয়া দেখতে! আমের বিন রবীআহ্ বলেন, তুমি কি তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে আশাবাদী? এতে কি তুমি ধরে নিয়েছ যে, সে ইসলাম গ্রহণ করবে? তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন আমের বিন রবীআহ্ বললেন, তুমি যাকে দেখেছ সে কখনোই ইসলাম গ্রহণ করবে না। খাত্তাবের গাধা ইসলাম গ্রহণ করতে পারে কিন্তু সে গ্রহণ করবে না। উম্মে আব্দুল্লাহ্ বলেন, হযরত উমরের ইসলামের বিষয়ে কঠোরতা এবং একগুঁয়েমি দেখে সে বিষয়ে নিরাশ হয়ে আমের বিন আব্দুল্লাহ্ এমন কথা বলেছিলেন অর্থাৎ ইসলামের এমন ঘোরতর শত্রু কীভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে?

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও নিজের ভাষায় উক্ত ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেছেন। তিনি (রা.) বলেন:

"ইসলামের প্রতি হযরত উমরের ঘোরতর শত্রুতা ছিল কিন্তু তাঁর মাঝে আধ্যাত্মিক যোগ্যতাও ছিল। অর্থাৎ তিনি প্রচণ্ড রাগী স্বভাবের হওয়া সত্ত্বেও, মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদেরকে কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও তাঁর মাঝে এক কোমল হৃদয়ও ছিল। যেমন আবিসিনিয়ায় যখন প্রথম হিজরত হয় তখন মুসলমানরা ফজর নামাযের পূর্বে মক্কা থেকে যাত্রার প্রস্তুতি নেয় যেন মুশরিকরা তাদের পথে প্রতিবন্ধক না হয় এবং তাদেরকে কোনরূপ কষ্ট না দেয়। মক্কায় এ রীতি

ছিল যে, নিশিতে কতক নেত্রীস্থানীয় ব্যক্তি শহরে টহল দিতেন যেন চুরি ইত্যাদি না হয়। অলিগলির খবরাখবর নিতেন। উক্ত রীতি অনুযায়ী হযরত উমরও নিশিতে ঘোরাফেরা করছিলেন এবং তিনি দেখেন, এক জায়গায় স্তুপাকারে বাড়ীর সমস্ত মালামাল বাঁধা আছে। তিনি সম্মুখে অগ্রসর হন। একজন মহিলা সাহাবী মালামালের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই মহিলা সাহাবীর স্বামীর সাথে সম্ভবত হযরত উমরের (আত্মীয়তার) সম্পর্ক ছিল। তাই সেই মহিলা সাহাবীকে লক্ষ্য করে (তিনি) বলেন,! ঘটনা কী? আমার মনে হচ্ছে, তোমরা কোন দীর্ঘ সফরের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছ। সেই সাহাবীয়ার স্বামী তথায় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি যদি সেখানে থাকতেন তবে হতে পারে যে, মক্কার মুশরিকদের শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণে হযরত উমরের এ কথা শুনে সে কোন অজুহাত দাঁড় করাতো, যাচ্ছি বা যাচ্ছি না অথবা স্বল্প দূরত্বে যাচ্ছি অথবা যেখানে যাচ্ছি তা অনতিদূরে। কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, উক্ত মহিলার এমন কোন অনুভুতি ছিল না। সেই মহিলার এমন কোন ধারণাই ছিল না। অথবা থাকলেও তিনি প্রকৃত বিষয়ই বলে দিয়েছিলেন। সেই মহিলা সাহাবী বলেন, উমর! আমরা মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তিনি বলেন, তোমরা মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমরা মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। হযরত উমর জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কেন মক্কা ছেড়ে যাচ্ছ? (সেই) মহিলা সাহাবী উত্তরে বলেন, উমর! আমাদের মক্কা ছেড়ে যাওয়ার কারণ হল, তুমি এবং তোমার ভাইয়েরা আমাদের এখানে বসবাস করা পছন্দ করো না আর এক-অদ্বিতীয় খোদার ইবাদত করার ক্ষেত্রে এখানে আমাদের স্বাধীনতা নেই। তাই আমরা স্বদেশ ছেড়ে ভিন্ন কোন দেশে চলে যাচ্ছি। হযরত উমর ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন এবং মুসলমানদেরকে মারার জন্য (সদা) প্রস্তুত থাকতেন তা সত্ত্বেও রাতের আঁধারে মহিলা সাহাবীর মুখে এ কথা শোনামাত্র যে, আমরা স্বদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি কারণ হল, তুমি এবং তোমার ভাইয়েরা আমাদের এখানে বসবাস করা পছন্দ করো না আর স্বাধীনভাবে আমাদেরকে এক-অদ্বিতীয় খোদার ইবাদত করতে দাও না- হযরত উমর নিজের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে ফেলেন আর সেই সাহাবীর নাম উচ্চারণ করে বললেন, **আচ্ছা যাও- আল্লাহ্ তোমাদের সহায় হোন।** মনে হয় হযরত উমর (রা.) এতটাই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি ভেবেছিলেন, আমি যদি অন্য দিকে মুখ না ফেরাই তাহলে আমার কান্না এসে যাবে। ততক্ষণে সেই মহিলা সাহাবীর স্বামীও ফিরে আসেন। তিনি জানতেন, উমর ইসলামের কঠোর শত্রু। তিনি তাকে সেখানে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে ভাবলেন, এ আবার আমাদের সফরের (ক্ষেত্রে) বাধা না সৃষ্টি করে। তিনি তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, এ এখানে কেন আসল? উত্তরে তিনি বলেন, সে এভাবে এসে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কোথায় যাচ্ছো? তখন তিনি বলেন, এ আবার কোন অনিষ্ট না করে বসে। উমর হয়তো ততক্ষণে ফিরে যাচ্ছিলেন বা সে সময় তাকে দাঁড়ানো দেখে থাকবে। এরপর তার আসার পূর্বেই বা নিকটে আসার পূর্বেই সেখান থেকে চলে গিয়েছিল অথবা তার সাথে সাক্ষাৎ করার পরই চলে গিয়ে থাকবে। যাহোক, তিনি বলেন, সে কোন অনিষ্ট না করে বসে। তখন সেই মহিলা সাহাবী বলেন, হে আমার চাচার ছেলে! (আরবের মহিলারা নিজেদের স্বামীকে সাধারণত চাচার ছেলে বলে সম্বোধন করতো) আপনি তো বলছেন

যে, সে কোন ক্ষতি না করে বসে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, সে কোন একদিন মুসলমান হয়ে যাবে কেননা, আমি যখন তাকে বললাম, উমর! আমরা এ কারণে মক্কা ছেড়ে যাচ্ছি যে, তুমি এবং তোমার ভাইয়েরা আমাদেরকে স্বাধীনভাবে এক খোদার ইবাদত করতে দাও না। তখন সে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় এবং বলে, ঠিক আছে, যাও। খোদা তোমাদের সুরক্ষা করুন। তার গলা কাঁপছিল এবং আমি মনে করি, তার চোখ অশ্রুসজল ছিল। এ কারণে আমার মনে হয়, অবশ্যই সে কোন না কোনদিন মুসলমান হয়ে যাবে।

হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের জন্য মহানবী (সা.) দোয়াও করেছিলেন। এ সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) দোয়া করেন,

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

হে আল্লাহ্! আবু জাহল এবং উমর ইবনুল খাত্তাবের মধ্যে তোমার নিকট যে বেশি পছন্দনীয় তুমি তাকে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দাও এবং তার দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করো। ইবনে উমর (রা.) বলেন, এই দু'জনের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার নিকট অধিক প্রিয় ছিলেন, হযরত উমর (রা.)। হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন, **اللهم ايد الدين بعمر ابن الخطاب** হে আল্লাহ্! তুমি উমর বিন খাত্তাবের মাধ্যমে ধর্মের সাহায্য করো। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, **اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصة** হে আল্লাহ্! তুমি বিশেষভাবে উমর বিন খাত্তাবের মাধ্যমে ইসলামকে সম্মানিত করো। হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের একদিন পূর্বে মহানবী (সা.) এই দোয়া করেছিলেন, **اللهم ايد الاسلام باحب الرجلين اليک عمر بن الخطاب او عمرو بن هشام** হে আল্লাহ্! এই দু'জনের মধ্যে তোমার নিকট যে অধিক প্রিয় তার মাধ্যমে তুমি ইসলামের সাহায্য ও সমর্থন করো অর্থাৎ উমর বিন খাত্তাব বা আমর বিন হিশামের মাধ্যমে। হযরত উমর (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন হযরত জিবরাঈল নাযিল হন এবং বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! উমরের ইসলাম গ্রহণের কারণে উর্ধ্বলোকের অধিবাসীরাও (আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশ্তারাও) আনন্দিত। তাবাকাতুল কুবরার বর্ণনা এটি।

হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ হলো, তিনি ৬ষ্ঠ নববীর যুল হজ্জ মাসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের কারণ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা এবং বর্ণনা হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে সীরাতুল হালবিয়াতে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে আর তা হল, একবার আবু জাহল লোকদেরকে বলল, হে কুরাইশগণ মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের উপাস্যদের মন্দ কথা বলে এবং তোমাদেরকে নির্বোধ আখ্যা দেয়, এমনকি তোমাদের উপাস্য সম্পর্কে বলে, তারা নাকি জাহান্নামের ইন্ধন হতে যাচ্ছে। তাই আমি ঘোষণা দিচ্ছি, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করবে সে আমার কাছ থেকে ১০০টি লাল ও কাল উট এবং এক হাজার অওকিয়া রূপা পুরস্কার পাবে। এক অওকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমান,

অর্থাৎ প্রায় ১২৬ গ্রাম, কারো কারো মতে এর চেয়েও বেশি হবে। কিন্তু যাহোক, এক অওকিয়া সমান ১২৬ গ্রাম, এ হিসেবে অনেক বড় অংক দাঁড়ায় যা পুরস্কার রূপে নির্ধারণ করা হয়েছিল। আরেকটি রেওয়ায়েত হলো, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করবে তাকে এত অওকিয়া স্বর্ণ, এত অওকিয়া রৌপ্য, এতটা কস্তুরী, এতগুলো দামি কাপড়-চোপড় এবং এগুলো ছাড়াও অন্যান্য আরো অনেক জিনিসপত্র দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। এ ঘোষণা শুনে হযরত উমর বলেন, আমি এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। তখন লোকেরাও বলে, হে উমর! নিঃসন্দেহে তুমিই এই পুরস্কার পাবে। এরপর হযরত উমর (রা.) তাদের সাথে এ ব্যাপারে রীতিমত চুক্তি করেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, এরপর আমি আমার কাঁধে নগ্ন তরবারি ঝুলিয়ে মহানবী (সা.)-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। পথিমধ্যে দেখি এক জায়গায় একটি বাছুর জবাই করা হচ্ছিল। আমি সেই বাছুরের পেট থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পাই যে, 'হে আলে যারিহ্! (যে বাছুরটিকে জবাই করা হচ্ছিল সেটির নাম ছিল যারিহ্) এক আহ্বানকারী আহ্বান করছে এবং স্পষ্ট ভাষায় বলছে আর এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয়ার প্রতি আহ্বান করছে যে, **'আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল।'**

হযরত উমর (রা.) বলেন, তখন আমি নিজেই নিজেকে বলি, এতে আমার প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। সীরাতে হালবিয়ার এই রেওয়ায়েতটি যদি সত্য হয় তাহলে মনে হয় এটি কোন কাশ্‌ফী দৃশ্য ছিল যা তিনি (রা.) সেই সময়ে দেখেছিলেন অথবা কোন দিক থেকে আওয়াজ এসে থাকবে।

হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে তৃতীয় যে রেওয়ায়েতটি রয়েছে তা হল– হযরত উমর (রা.) বর্ণান করেন, একদিন আমি কাবা শরীফের তওয়াফের উদ্দেশ্যে আসি আর তখন মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। সেই যুগে নামায পড়ার সময় তিনি (সা.) সিরিয়ার দিকে মুখ করে নামায পড়তেন, অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসের পাথরের দিকে। এভাবে তিনি (সা.) কাবা শরীফকে নিজের এবং সিরিয়ার, অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসের মাঝে রাখতেন। এভাবে তাঁর নামাযের স্থানটি হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যখানে হতো। রুকনে ইয়ামানী হচ্ছে, কাবা শরীফের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনা যা ইয়েমেনের দিকে। কেননা, এখানে না দাঁড়ালে 'বাইতুল মুকাদ্দাস' কে সামনে রাখা সম্ভব হতো না। যাহোক, হযরত উমর (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-কে দেখার পর আমি ভাবলাম, আজ রাতে আমিও মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণী শুনব যে, তিনি কী বলেন? পরক্ষণেই আমি চিন্তা করি, তাঁর কথা শোনার জন্য আমি যদি তাঁর নিকটে যাই তাহলে তিনি টের পেয়ে যাবেন, এজন্য আমি 'হাজরে আসওয়াদ'-এর দিক থেকে এসে কাবা শরীফের গিলাফের ভেতর ঢুকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকি। মহানবী (সা.) সেভাবেই নামাযে মগ্ন থাকেন। তিনি (সা.) সূরা রহমান পাঠ করেন। এগিয়ে আসতে আসতে আমি মহাবনী (সা.)-এর একেবারে সম্মুখে এসে পড়ি, (অর্থাৎ) তিনি (সা.) যেদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে। আমার এবং তাঁর (সা.) মাঝে কাবার গিলাফ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত শোনার পর

আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে যায় এবং আমি কাঁদতে আরম্ভ করি আর ইসলাম আমার হৃদয়ে স্থান করে নেয়। মহানবী (সা.) তাঁর নামায শেষ করে সেখান থেকে ফিরে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি। এরপর আমি মহানবী (সা.)-এর পিছু নিয়ে চলতে থাকি। মহানবী (সা.) আমার পদধ্বনি শুনে আমাকে চিনে ফেলেন আর তিনি (সা.) এটি মনে করেন যে, কোন ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে আমি তাঁর পিছু নিয়েছি। মহানবী (সা.) আমাকে বকা দিয়ে বলেন, হে ইবনে খাত্তাব! এত রাতে তুমি কোন মতলবে এসেছো? আমি নিবেদন করি, আমি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রসূলের প্রতি আর তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনার জন্য এসেছি।

চতুর্থ রেওয়ায়েতটিতে হযরত উমর (রা.) বলেন, এক রাতে আমার বোনের প্রসব বেদনা উঠে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি এবং দোয়া করার জন্য কাবা শরীফের গিলাফ জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। মহানবী (সা.) তখন আসেন এবং হাজরে আসওয়াদের কাছে আল্লাহ্ যতটুকু চেয়েছেন ততটুকু নামায পড়ে চলে যান। আমি তখন এমন বাক্য শুনেছি যা আমি এর পূর্বে কখনো শুনিনি। মহানবী (সা.) যখন সেখান থেকে প্রস্থান করেন তখন আমি তাঁর পিছু পিছু যেতে থাকি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কে? উত্তরে বলি, আমি উমর। তিনি (সা.) বলেন, হে উমর! তুমি রাতেও ছাড় না আর দিনের বেলাও ছাড় না। একথা শুনে আমি ভীত হই, পাছে আবার তিনি আমাকে অভিশাপ না দেন। আমি তৎক্ষণাৎ বলি, **আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্নাকা রসূলুল্লাহ্**। অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রসূল। তখন তিনি আমাকে বলেন, হে উমর! তুমি কি তোমার ইসলামকে গোপন রাখতে চাও? আমি নিবেদন করি, না। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, আমি আমার ইসলাম গ্রহণের কথা ঠিক সেভাবেই ঘোষণা করবো যেভাবে আমি আমার শির্‌কের ঘোষণা করতাম। একথা শুনে তিনি (সা.) আল্লাহ্‌র প্রশংসা কীর্তন করে বলেন, হে উমর! আল্লাহ্ তোমাকে হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। এরপর তিনি আমার বুকে হাত বুলিয়ে আমার অবিচল থাকার বিষয়ে দোয়া করেন। এরপর আমি মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে চলে যাই এবং তিনি (সা.) নিজ গৃহে চলে যান।

ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে পঞ্চম যে প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত রয়েছে তার কিছুটা আলোচনা পূর্বেও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেই রেওয়ায়েতটি হল, হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন হযরত উমর নগ্ন তরবারী নিয়ে বের হন। পথিমধ্যে বনু যোহরার জনৈক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয়। সে তাকে জিজ্ঞেস করে, হে উমর! যাচ্ছ কোথায়? হযরত উমর (রা.) উত্তরে বলেন, মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করতে যাচ্ছি (নাউযুবিল্লাহ্)। সে বলে, মুহাম্মদকে (সা.) হত্যা করে তুমি কি বনু হাশেম এবং বনু যোহরার হাত থেকে নিরাপদে থাকতে পারবে? হযরত উমর বলেন, আমি মনে করি, তুমি সাবী (অগ্নিপূজারী) হয়ে গেছ। যে ধর্মে ছিলে সে ধর্ম থেকে

তুমি বিমুখ হয়ে গেছ। সেই ব্যক্তি বলল, হে উমর! আমি কি তোমাকে এরচেয়েও আশ্চর্যের কথা বলব না? তুমি আমাকে বলছ যে, আমি সাবী হয়ে গেছি। তোমাকে আমি এরচেয়েও গুরুতর কথা বলি শোন, তোমার বোন এবং ভগ্নিপতি উভয়ই সাবী হয়ে গেছে এবং তুমি যে ধর্মে আছ তারা সে ধর্ম ত্যাগ করেছে। একথা শুনে হযরত উমর উভয়কে তিরস্কার করতে করতে তাদের বাড়িতে আসেন। তাদের উভয়ের কাছে তখন মুহাজিরদের অন্যতম সাহাবী হযরত খাব্বাব (রা.)ও উপস্থিত ছিলেন। হযরত খাব্বাব (রা.)'র প্রেক্ষাপটে আমি এ ঘটনা ইতিপূর্বে বর্ণনাও করেছি। তিনি যখন হযরত উমরের আওয়াজ শুনতে পান তখন তিনি ঘরের ভেতরই লুকিয়ে পড়েন। হযরত উমর ঘরে প্রবেশ করে বলেন, তোমরা কী পড়ছিলে? তোমাদের যে আওয়াজ শুনছিলাম তা কী ছিল? তখন তারা সূরা ত্বাহা পড়ছিলেন। তারা বললেন, আমরা আমাদের নিজেদের মাঝে একটি কথা বলছিলাম তাছাড়া কিছুই নয়। হযরত উমর বললেন, আমি শুনলাম তোমরা দু'জন নাকি স্বীয় ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছ! হযরত উমর (রা.)'র ভগ্নিপতি বলেন, হে উমর! তুমি কি কখনো গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছ? সত্য তোমার ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মেও থাকতে পারে? সত্যের সন্ধানই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে, তুমি কি কখনো গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছ যে, অন্য ধর্মেও সত্যতা থাকতে পারে? একথা শুনে হযরত উমর তার ভগ্নিপতিকে ধরে কঠিনভাবে প্রহার করতে থাকেন। তার বোন নিজ স্বামীকে রক্ষা করতে আসলে হযরত উমর তার ওপরও হাত তোলেন। এরফলে তার বোনের মুখ থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন, হে উমর! সত্য যদি তোমার ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মে থাকে তাহলে তুমি সাক্ষ্য দাও যে, **আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং সাক্ষ্য দাও, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল**। হযরত উমর নিরূপায় হয়ে বলেন, আমাকে সেই কিতাব দাও যা তোমাদের কাছে আছে, আমি সেটি পড়ব আর হযরত উমর পড়তে জানতেন। তার বোন বললেন, তুমি অপবিত্র আর এ গ্রন্থ কেউ অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করতে পারে না। অতএব, তুমি উঠে গোসল কর বা অন্তত ওযু কর। হযরত উমর (রা.) ওযু করে আসেন এবং গ্রন্থটি নিয়ে পড়তে শুরু করেন। যে অংশটি তিনি পড়ছিলেন সেটি সূরা ত্বাহার অংশবিশেষ ছিল। তিনি যখন এই আয়াতে পৌঁছেন,

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই, অতএব তোমরা কেবল আমারই উপাসনা কর এবং আমার স্মরণে নামায প্রতিষ্ঠা কর। এই আয়াত পাঠ করার পর হযরত উমর (রা.) বলেন, আমাকে বল মুহাম্মদ (সা.) কোথায় আছেন? একথা শুনে হযরত খাব্বাব (রা.) কামরার ভেতরে যেখানে লুকিয়ে ছিলেন সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বলেন, হে উমর (রা.)! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমি মনেপ্রাণে চাই মহানবী (সা.) বৃহস্পতিবার রাতে যে দোয়া করেছেন, তা যেন তোমার অনুকূলে গৃহীত হয়। তিনি (সা.) দোয়া করেছিলেন, **আল্লাহুম্মা আয়িয্‌যাল ইসলামা বিউমারাবনিল খাত্তাব আও বিআমরিবনে হিশাম** অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ! তুমি ইসলামকে উমর

ইবনুল খাত্তাব অথবা আমর ইবনুল হিশাম-এর মাধ্যমে সম্মানিত কর। সেই সময় মহানবী (সা.) সাফা গুহার পাদদেশে অবস্থিত একটি গৃহে অবস্থান করছিলেন। হযরত উমর (রা.) সেই বাড়ির প্রবেশদ্বারে এসে উপস্থিত হন। সেই সময় সেই গৃহের প্রবেশদ্বারে হযরত হামযা এবং হযরত তালহা (রা.) ছাড়াও মহানবী (সা.)-এর অন্যান্য কিছু সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। হযরত হামযা যখন দেখেন সাহাবীরা উমর (রা.)-কে দেখে ভয় পাচ্ছে, তখন তিনি বলেন, আচ্ছা উমর এসেছে! যদি আল্লাহ্ তা'লা তাকে কোন মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে এখানে এনে থাকেন তবে সে ইসলাম গ্রহণ করে মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য করবে। এছাড়া তার অন্য কোন দুরভিসন্ধি থাকলে তাকে হত্যা করা আমাদের জন্য সহজ। মহানবী (সা.) বাসগৃহের ভেতরে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর প্রতি তখন ওহী অবতীর্ণ হচ্ছিল। তিনিও (সা.) বাইরে আসেন এবং উমর (রা.)'র নিকটে এসে তার বুকের কাপড় ধরে বলেন, হে উমর! আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে ওয়ালীদ বিন মুগিরাহ্কে লাঞ্ছিত করেছিলেন, সেভাবে তোমাকেও লাঞ্ছিত না করা পর্যন্ত এবং যন্ত্রণাদায়ক ঐশী শাস্তি অবতীর্ণ না করা পর্যন্ত কি নিবৃত্ত হবে না? এরপর তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করেন, হে আল্লাহ! **এই হলো, উমর ইবনুল খাত্তাব। তুমি ইসলামকে উমর ইবনুল খাত্তাবের মাধ্যমে সম্মানিত কর।** অতঃপর হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহ্র রসূল। এই বলে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। এরপর তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রসূল, ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আপনি এখন বাইরে বের হন।

মা'মার এবং যুহরী বর্ণনা করেন, দ্বারে আরকামে মহানবী (সা.)-এর আসার পর হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং দ্বারে আরকামে যে চল্লিশ বা চল্লিশের অধিক নারী ও পুরুষ এসে মুসলমান হয়েছিলেন, তাদের মাঝে তিনি সর্বশেষ বয়আতকারী ব্যক্তি ছিলেন। দ্বারে আরকাম সেই ঘর বা কেন্দ্রের নাম যেটা একজন নবদীক্ষিত মুসলমান আরকাম বিন আরকামের বাসস্থান ছিল এবং এটি মক্কা থেকে কিছুটা দুরে অবস্থিত। সেখানে মুসলমানরা সমবেত হয়ে ধর্ম শিখতেন। ইবাদত ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজের জন্য সেটি কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এই সুখ্যাতির কারণেই এই স্থানটি **'দারুল ইসলাম'** নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করে। মক্কায় এটি তিন বছর পর্যন্ত মুসলমানদের কেন্দ্র ছিল। সেখানেই সবাই গোপনে ইবাদত করতেন, মহনবী (সা.)-এর বৈঠক বসতো। যখন হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন মুসলমানরা প্রকাশ্যে ধর্মপ্রচার আরম্ভ করে। রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত উমর (রা.) সেই কেন্দ্রে ইসলাম গ্রহণকারী শেষ ব্যক্তি ছিলেন, যার ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানরা অনেক দৃঢ়তা লাভ করে আর তারা প্রকাশ্যে বের হয়ে ইসলাম প্রচারের কাজ আরম্ভ করেন।

হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের এই ঘটনা কিছুটা ভিন্নতাসহ অপর একটি রেওয়ায়েতেও বর্ণিত হয়েছে। উপরোক্ত বর্ণনাতে সূরা ত্বাহার প্রারম্ভিক আয়াতের উল্লেখ আছে

তবে অন্য বর্ণনায় সূরা হাদীদের প্রারম্ভিক আয়াতের উল্লেখ রয়েছে, যেগুলো হযরত উমর (রা.) তার বোনের বাসায় পাঠ করেন।

হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের ষষ্ঠ একটি রেওয়ায়েতও রয়েছে। হযরত উমর (রা.) নিজে বর্ণনা করেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন আমি মহানবী (সা.)-এর সন্ধানে বের হই। আমি দেখি, তিনি (সা.) আমার পূর্বেই মসজিদে পৌঁছে গেছেন। আমি তাঁর (সা.) পেছনে দাঁড়িয়ে যাই, মহানবী (সা.) সূরা আল্ হাক্কা পাঠ করতে আরম্ভ করেন। আমি পবিত্র কুরআনের (আয়াতের) গঠন ও বিন্যাস দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই। আমি বলি, খোদার কসম! কুরাইশরা যেমনটি বলে থাকে, সত্যিই ইনি একজন কবি। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি একথা ভাবতেই মহানবী (সা.)

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ

আয়াতগুলো পাঠ করেন। অর্থাৎ নিশ্চয়ই এই (কুরআন) এক সম্মানিত রসূলের (দ্বারা আনিত) কালাম। এবং এটি কোন কবির কাব্য নয়, কিন্তু (পরিতাপ যে) তোমরা অল্পই ঈমান আন। (সূরা আল্ হাক্কা, ৪০-৪১) হযরত উমর বলেন, ইনি তো দেখি গণক, জাদুকর। অতঃপর মহানবী (সা.) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন।

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ- تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ- وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ- لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ- ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ- فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ-

এভাবে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। অর্থাৎ এটি কোন গণকেরও কথা নয়, কিন্তু তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর। এটি জগতসমূহের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এবং সে যদি কোন মিথ্যা রচনা করে আমাদের প্রতি আরোপ করতো, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তাকে ডান হাতে পাকড়াও করতাম। অতঃপর আমরা তার জীবন-শিরা কেটে দিতাম। তখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউই আমার হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে পারত না। (সূরা আল্ হাক্কা, ৪২-৪৮) হযরত উমর বলেন, তখন থেকে ইসলাম আমার হৃদয়ে বাসা বেঁধে নেয়।

সপ্তম একটি রেওয়ায়েতও আছে। এটি বুখারীর বর্ণনা। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি যখনই হযরত উমর (রা.)-কে কোন বিষয়ে বলতে শুনেছি যে, আমার মনে হয় বিষয়টি এমন, বাস্তবে ঠিক তেমনই হতো যেমনটি তিনি (রা.) ধারণা করতেন। একবার হযরত উমর (রা.) বসে ছিলেন। তাঁর (রা.) পাশ দিয়ে এক সুদর্শন ব্যক্তি অতিক্রম করে। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার ধারণা হয়তো ভুল হবে। এই ব্যক্তি হয়তো তার অজ্ঞতার যুগের ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়তো এ ব্যক্তি তাদের গণক। সেই ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে আস। তাকে তাঁর (রা.) কাছে ডেকে আনা হয়। তিনি (রা.) সেই ব্যক্তিকে তা-ই বলেন। সে বলল, আমি আজকের দিনের মত কোন দিন দেখিনি যখন কোন মুসলমানকে এভাবে স্বাগত জানানো হয়েছে। সেই ব্যক্তি পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি তোমাকে শপথ দিয়ে বলছি, আমাকে

অবশ্যই বলতে হবে। সেই ব্যক্তি বলে, আমি অজ্ঞতার যুগে তাদের গণক ছিলাম। হযরত উমর (রা.) বলেন, তোমার নারী জ্বীন তোমার কাছে এনেছে এমন কোন বিস্ময়কর কথা থেকে থাকলে আমাকে বল। সে বলে, আমি একদিন বাজারে ছিলাম। সেই নারী জ্বীন আমার কাছে আসে। আমি তার মাঝে একটি ভীতি দেখতে পাই। সেই জ্বীন আমাকে বলে, তুমি কি জ্বীনদের দেখ নি? তাদের দুশ্চিন্তা, আশ্চর্য হওয়া, উটনী এবং পালানের সাথে গিয়ে মিলিত হওয়াকে লক্ষ্য কর নি? হযরত উমর (রা.) বলেন, তুমি সত্য বলেছ। একবার আমি তাদের প্রতিমার কাছে শুয়ে ছিলাম। এক ব্যক্তি একটি বাছুর নিয়ে আসে এবং জবাই করে। তখন এক আহবানকারী চিৎকার দেয়। তার চেয়ে উচ্চস্বরে আর কাউকে চিৎকার করতে আমি শুনি নি। সে বলছিল, হে সীমালঙ্ঘনকারী শত্রু! এটি একটি অনেক মহৎ কাজ, এক সুবক্তা বলছে, **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্** অর্থাৎ আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই। তখন সবাই উঠে দাঁড়ায়। আমি বললাম, পিছনে কোন ব্যক্তি আছে তা না জানা পর্যন্ত আমি বের হবে না। আবার আওয়াজ আসে, হে সীমালঙ্ঘনকারী শত্রু! এটি একটি অনেক মহৎ কাজ, এক সুবক্তা যে বলে, **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্** অর্থাৎ আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই। এরপর আমিও দাঁড়িয়ে যাই। কিছুদিন যেতে না যেতেই বলা আরম্ভ হল যে, এই ব্যক্তি নবী। বুখারীর কোন কোন সংস্করণে **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্**র স্থানে **লা ইলাহা ইল্লা আনতা**-ও ব্যবহৃত হয়েছে। যাহোক, হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ইতিহাস এবং সীরাতগ্রন্থে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। তন্মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থে বর্ণিত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত সেটিই– যাতে উল্লেখ আছে, হযরত উমর (রা.) তরবারী নিয়ে মহানবী (সা.)-কে (নাউযুবিল্লাহ্) হত্যা করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন; পথিমধ্যে কেউ তাঁকে বলেছিল, নিজের বোন তথা নিজের বাড়ির খবর নিন। (একথা শুনে) তিনি তাঁর বোন ও ভগ্নিপতির বাড়ি যান। এ রেওয়ায়েতটিই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য আর এর ঘটনাই অধিকাংশ স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। যদিও এ সম্পর্কে আরো অনেকগুলো রেওয়ায়েত রয়েছে– যেগুলো আমি বর্ণনা করেছি। যাহোক, যেসব রেওয়ায়েত আমি বর্ণনা করেছি সেগুলো সম্পর্কে বা সেগুলো নিয়ে ঐতিহাসিকগণ এবং জীবনীকারগণ অনেক পর্যালোচনা ও সমালোচনা লিখেছেন। কিন্তু আমরা তো সবগুলোর মধ্যে সেই রেওয়ায়েতকেই সঠিক মনে করি, যেটি বোন ও ভগ্নিপতির বাড়িতে আসা সংক্রান্ত ছিল। আর এরপর তিনি সেখান থেকে দ্বারে আরকামে যান। এমনটিও বলা যেতে পারে, আর এটির সম্ভাবনাও খুব বেশি যে, হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ সম্বন্ধে উল্লেখিত সবগুলো রেওয়ায়েতই নিজ নিজ অবস্থানে সঠিক। যা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বিভিন্ন সময় হযরত উমর (রা.)'র মনের মাঝে পরিবর্তন সৃষ্টি হবার নানাবিধ ঘটনা ঘটতে থেকেছে। অনেক সময় পরিবর্তন সংঘটিত হবার বিভিন্ন ঘটনা ঘটতে থাকে, কিন্তু চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। চূড়ান্ত ঘটনা সেটিই ঘটেছিল যখন তিনি তার বোন ও ভগ্নিপতির বাড়িতে পবিত্র কুরআন শোনেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার জন্য মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে যান। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন।

হযরত উমর (রা.)'র বয়স তখন ৩৩ বছর ছিল আর তিনি তাঁর গোত্র বনু আদী'র নেতা ছিলেন। যখন তিনি বয়আত করেন বা ইসলাম গ্রহণ করেন তখন পর্যন্ত কুরাইশদের দূতের পদটি তাঁর কাছেই ছিল। এমনিতেও তিনি অত্যন্ত প্রতাপশালী, সাহসী ও নির্ভীক মানুষ ছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলামানরা অনেক শক্তি অর্জন করে, আর তারা দ্বারে আরকাম থেকে বেরিয়ে এসে প্রকাশ্যে মসজিদুল হারামে (কাবা শরীফে) নামায পড়েন। হযরত উমর (রা.) দ্বারে আরকামে ঈমান আনয়নকারী শেষ সাহাবী ছিলেন আর এটি ছিল নবুয়্যতের ষষ্ঠ বছরের শেষ মাসের ঘটনা। তখন মক্কায় মুসলমান পুরুষের সংখ্যা ছিল ৪০ জন। অবশিষ্ট ঘটনাবলী আমি আগামী বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি কয়েকজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করতে চাই, যাদের জানাযা পড়াবো। এদের মাঝে প্রথমে রয়েছেন, আহমদ মুহাম্মদ উসমান শবুতী সাহেব, যিনি ইয়েমেনের মুহাম্মদ উসমান শবুতী সাহেবের পুত্র ছিলেন। ৯ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে ৮৭ বছর বয়সে মিশরে তার মৃত্যু হয়, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আহমদ মুহাম্মদ উসমান শবুতী সাহেবের জন্ম হয় ইয়েমেনের এডেন শহরে। জনাব গোলাম আহমদ সাহেব যখন মুবাল্লিগ হিসেবে এডেন যান তখন শবুতী সাহেব ১৪ বছর বয়সে বয়আত করেন। পরবর্তীতে জামা'তে আহমদীয়া ইয়েমেন-এ তিনি বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং দীর্ঘ সময় যাবৎ তিনি জামা'তে আহমদীয়া, ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য পাচ্ছিলেন আর দায়িত্ব পালন করা অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়। অর্থাৎ আমৃত্যু তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ডাক্তার মুহাম্মদ আহমদ আদনী সাহেবের কন্যা শ্রদ্ধেয়া ওয়াসীমা মুহাম্মদ সাহেবার সাথে তার বিয়ে হয়, যিনি দিল্লী নিবাসী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত হাজী মুহাম্মদ দ্বীন সাহেব এবং মহিলা সাহাবী হযরত হুসাইনা বিবি সাহেবা (রা.)'র পৌত্রী ছিলেন। শবুতী সাহেবের বিয়েও রাবওয়াতেই হয়েছিল, কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে হয়েছিল। যাহোক, এরপর কেন্দ্রের সাথে তার সম্পর্ক গড়ে উঠে। শবুতী সাহেব রাবওয়া যাওয়ারও সুযোগ পান এবং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র সাথে সাক্ষাতের সম্মানও অর্জন করেন। বুযূর্গ এবং সাহাবীদের সাথেও তিনি সাক্ষাৎ করেন। শবুতী সাহেব যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নার্সিং ও হেল্‌থ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন এবং লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা (হেল্‌থ এডমিনিস্ট্রেশন) বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। ইয়েমেন সেন্ট্রাল হেল্‌থ ইনস্টিটিউটের ডিনের পদসহ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তিনি প্রায় ২৯ বছর ধরে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো ছাড়াও বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার খণ্ডকালীন উপদেষ্টা হিসেবেও সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং কয়েক মাস পূর্বে মিশরে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে তার চিকিৎসা চলছিল কিন্তু যুক্তরাজ্যে আসার চেষ্টা ছিল। কিন্তু এরপর রোগের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ার ফলে

কয়েকদিন হাসপাতালে থাকার পর অবশেষে ৯ এপ্রিল নিজের মহান স্রষ্টার সমীপে ফিরে যান। মরহুম মূসী (ওসীয়্যতকারী) ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও এক পুত্র আমেরিকা প্রবাসী ডা. মুহাম্মদ শবুতী ও তিন কন্যা এবং নাতি-নাতনিদের রেখে গিয়েছেন। বড় মেয়ে ইয়েমেনে আছেন, এক মেয়ে জার্মানিতে থাকেন আর মারওয়া শবুতী সাহেবা আমাদের এখানে যুক্তরাজ্যে আছেন, এমটিএ আল্ আরাবিয়ায় সেবা প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করছেন। তার কন্যা মারওয়া শবুতী বলেন, জান্নাত মায়ের পদতলে– একথা তো ঠিক, কিন্তু আমি আমার বাবার কাছেও মায়ের মতই আদর-স্নেহ পেয়েছি। কিংবা এভাবেও বলা যায়, বাবা ও মায়ের ভালোবাসার মধ্যে আমি কখনোই পার্থক্য অনুভব করি নি। তিনি বলেন, আমার পিতা মুত্তাকী, সৎকর্মশীল, উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং অত্যন্ত বিনয়ী একজন মানুষ ছিলেন। ধৈর্য, সততা ও বিশ্বস্ততার মূর্ত প্রতীক, দরিদ্র-বৎসল এবং সবার প্রতি, বরং বলা উচিত গোটা মানবজাতির প্রতি ভালোবাসা পোষণ করতেন। যারাই তার সম্পর্কে লিখেছেন তাদের অনেকেই এই কথাগুলো লিখেছেন। তার পরিচিত অ-আহমদীরাও তার সম্পর্কে এসব কথা লিখেছেন। নিজের কাজগুলোকে তিনি নিপুণভাবে সম্পন্ন করতেন। সময়ানুবর্তী ও প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সচেতন ছিলেন। প্রায়শই ইবাদত ও নফল আদায়ে ব্যস্ত থাকতেন এবং ফরয নামাযের ব্যাপারে খুবই সচেতন থাকতেন। তিনি বলেন, ২০০২ সনে তার পিতামাতা উভয়ই বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

ইয়েমেন জামা'তের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট খালেদ আলী আস্ সাবরী সাহেব বলেন, মরহুম বার্ধক্য সত্ত্বেও প্রতাপান্বিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। অত্যন্ত সহৃদয়, সদা-হাস্যময়, উদার ও অতিথি-বৎসল ব্যক্তি ছিলেন। সব আহমদীর সাথে স্নেহশীল পিতার মত আচরণ করতেন। জামা'তের যেকোন প্রয়োজনে নিজের পকেট থেকে খরচ করতেন এবং জামা'তের ব্যবহার্য জিনিসপত্র যেমন প্রিন্টার, ফ্যাক্স মেশিন প্রভৃতি নিজেই কিনে দিতেন। দরিদ্র ও অসহায়দের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহপরায়ণ ছিলেন। প্রত্যেক অস্বচ্ছল আহমদীর জন্য মন খুলে খরচ করতেন। আহমদী এতীম ও বিধবাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতেন। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত একটি পরিবারের বাড়িভাড়াও নিজের পকেট থেকে দিতেন। বার্ধক্য সত্ত্বেও ২০১৮ সালে এডেন থেকে সানা পর্যন্ত ২০ ঘন্টার সুদীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য পথ পাড়ি দিয়ে যান, ওই সময় সৌদি আক্রমণের কারণে যাত্রাপথ অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল এবং বিভিন্ন স্থানে চেকিং-ও হতো। বার্ধক্যের কারণে চলাফেরা করাটাও তার জন্য কষ্টকর ছিল। এই সফর তিনি কেবলমাত্র সানা জামা'তের সাথে ঈদের নামায পড়ার উদ্দেশ্যে এবং অস্বচ্ছল পরিবারগুলোকে ঈদী দেয়ার জন্য আর তাদের সাথে ঈদের আনন্দে অংশীদার হওয়ার জন্য করেছিলেন। সেই সময় জামা'তের সকল সদস্য তার আগমনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে জনাব কুরাইশী যাকাউল্লাহ্ সাহেবের। তিনি জলসা সালানা দপ্তরের হিসাবরক্ষক (একাউন্টেন্ট) ছিলেন। তিনিও ৯ এপ্রিল তারিখে ৮৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন,

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। কুরাইশী সাহেবের পরিবারে আমদীয়াতের সূচনা হয়েছিল তার নানা এবং তার স্ত্রীর দাদা হযরত খুরশীদ আলী সাহেব (রা.)'র মাধ্যমে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শিয়ালকোট এলে হযরত খুরশীদ আলী সাহেব ১৬ বছর বয়সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। কুরাইশী সাহেবের স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেছেন। তার পাঁচ মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছেন, ছেলে কুরআনের হাফিয এবং এখানে যুক্তরাজ্যেই বসবাস করেন। এক কন্যা রাবওয়ার পিএস দপ্তরে কর্মরত আমাদের এক কর্মীর সহধর্মিণী, দ্বিতীয় কন্যা ম্যানচেস্টারে বসবাস করেন এবং আরেক কন্যা মৃত্যুবরণ করেছেন। ১৯৫৪ সালে তিনি রিলিভিং ক্লার্ক হিসেবে জামা'তের সেবা শুরু করেন। নিগরান বোর্ডের সদর হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)'র অধীনে তিনি কাজ করেন। ৫৮ বছরের অধিককাল তিনি সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, রাবওয়ায় চাকরি করেন। তার পুত্র হাফিয শামসুয্ যোহা বলেন, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-এর সাথে তিনি কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন আর হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)'র বাড়িতে তার যাতায়াত ছিল। প্রথম দিন তিনি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)'র বাড়িতে গেলে তিনি তাকে বলেন, আপনি বসুন। তিনি বলেন, আমি তখন বলি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সন্তানের সামনে একই উচ্চতার আসনে আমি কীভাবে বসতে পারি? এতে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, **'আল আমরু ফাওকাল আদাব',** অর্থাৎ নির্দেশ পালন ভদ্রতা ও সম্মান প্রদর্শনের ওপর প্রাধান্য রাখে। এরপর তিনি বসে পড়েন। অনেক সম্মান করতেন। তিনি বলেন, আমার পিতা একজন নীরব প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। পাঁচবেলার নামায বাজামাত তো পড়তেনই, সাথে সাথে তাহাজ্জুদের নামাযও রীতিমত পড়তেন। অন্যান্য প্রয়াত ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে চাঁদা প্রদান করতেন। নিজের বংশের বুযূর্গদের নিজের বাড়িতে রেখে তাদের সেবা করতেন। কয়েকজনের মৃত্যুও আমাদের বাড়িতে হয়েছে। খিলাফতের সাথে অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল আর আমাদের মাঝেও এই বৈশিষ্ট্য যাতে সৃষ্টি হয় সে চেষ্টায় রত থাকতেন। শৈশবে আমাকে সাথে করে নামাযে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রায়শই পথিমধ্যে তিনি বলতেন, যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে যখনই তোমাকে কোন কাজে ডাকা হবে তা করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকবে। কোন কোন দরিদ্র পরিবারের ব্যয়ভার তিনি বহন করেছেন। তার মেয়ে আমাতুস্ সালাম বলেন, আমার পিতা তার নিজস্ব সম্পত্তি থেকে এক কানাল (প্রায় ১৩ ডেসিমেল) জমি রাবওয়ার নাসিরাবাদ সুলতান মহল্লাতে মসজিদ নির্মাণের জন্য সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নামে উপহারস্বরূপ প্রদান করেছিলেন। সাধারণত তিনি এক মাসে দু'বার কুরআন খতম করতেন। পাঁচ কন্যা এবং এক পুত্র ছিল, সব ভাই-বোনদের ভালোভাবে লেখাপড়া করিয়েছেন, তাদের উত্তমরূপে তরবীয়ত করেছেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে কানাডার জনাব খালেক দাদ সাহেবের। তিনি ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার নানা কাদিয়ানের ব্যবসায়ী হযরত শেখ নূরুদ্দীন সাহেব

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তার দাদা মোহতরম মওলা দাদ সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)'র হাতে বয়আত করে আহমদীয়াতের ভুবনে পদার্পণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

দীর্ঘ সময় তিনি করাচীতে হালকা প্রেসিডেন্ট হিসেবে খিদমত করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। কানাডায় অর্থ বিভাগে সেবা করেছেন। নিয়মিত নামায ও রোযায় অভ্যস্ত, সহানুভূতিশীল, দয়ার্দ্র, দরিদ্র-বৎসল, পুণ্যবান, নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত মানুষ ছিলেন। চাঁদা প্রদান ও আর্থিক তাহরীকসমূহে অংশ নেয়ার ক্ষেত্রে সর্বদা অগ্রগামী থাকতেন। খিলাফতের সাথে গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল আর আমিও তার মাঝে এটি লক্ষ্য করেছি যে, খিলাফতের প্রতি অসাধারণ সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ্‌র কৃপায় মরহুম প্রাথমিক মূসীদের একজন ছিলেন। তিনি তাঁর অবর্তমানে স্ত্রী ছাড়াও চার পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন। তার এক পুত্র কানাডার ন্যাশনাল আমেলায় দায়িত্ব পালন করছেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ মুহাম্মদ সেলিম সাবের সাহেবের, তিনি উমুরে আম্মা বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। গত ২৭ মার্চ ৭৭ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। সেলিম সাবের সাহেবের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয়েছিল তার পিতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মিয়াঁ নূর মুহাম্মদ সাহেবের মাধ্যমে। তার পিতা কাদিয়ানের নিকটবর্তী ওয়ানজওয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৯০৩ সালে তিনি স্বয়ং কাদিয়ানে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন।

১৯ মে ১৯৬২ সালে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ায় তার পদায়ন হয়। এরপর ১৯৬৮ সালে দিওয়ান বিভাগ থেকে প্রাইভেট সেক্রেটারী দপ্তরে তার বদলী হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) নিজে নিজের দপ্তরের জন্য তাকে মনোনীত করেন। এরপর ১৯৮৭ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনি উমুরে আম্মা দপ্তরে মুহতাসেব (হিসাব রক্ষক) ছিলেন। প্রায় ৫৯ বছর তিনি জামাতের সেবা করেছেন। মরহুম মূসী ছিলেন। তার ভাতিজা ও জামাতা বলেন, তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন। নামাযে সাধারণত আর তাহাজ্জুদে বিশেষত এত বেদনার সাথে দোয়া করতেন যে, তার সাথে যে লোক বসতো তার মনও গলে যেত। নতুন প্রজন্মকে নিয়মিত যুগ খলীফার প্রতি আনুগত্যের শিক্ষা দিতেন। অফিসের নির্ধারিত সময় ছাড়াও তিনি অফিসে সময় দিতেন। জামা'তের যে কোন সদস্যের দুঃখকষ্টকে নিজের দুঃখকষ্ট এবং মানুষের বিপদাপদকে নিজের বিপদাপদ মনে করতেন। যুগ খলীফা এবং জামা'তের আনুগত্যের বিষয়টিকে সামনে রেখে মানুষের সমস্যাগুলোর সমাধান করতেন। সর্বদা দরূদ শরীফ যপ করতেন, নীরবে গরীবদের সাহায্য করতেন, এমন অগণিত গুণের আধার ছিলেন তিনি।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ শ্রদ্ধেয়া নাইমা লতীফ সাহেবার যিনি আমেরিকা নিবাসী সাহেবযাদা মাহ্‌দী লতিফ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। ১০ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুমার

স্বামী জনাব সাহেবযাদা মাহ্‌দী লতীফ সাহেব হযরত সাহেবযাদা শহীদ আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.)'র পৌত্র। মরহুমা ১৯৬৯ সালে পেশওয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদবিদ্যায় মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন আর এরপর রিসার্চ ইন্সটিটিউট, পেশওয়ার-এর বোটানি ডিপার্টমেন্টে গবেষণার কাজ শুরু করেন। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত তিনি এখানেই ছিলেন। ১৯৭০ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)'র তাহরীকে নুসরত জাহাঁ স্কীমের অধীনে তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি এবং তার ছোট ভাই সাঈদ মালিক সাহেব নাইজেরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন আর সেখানে অবস্থানকালীন সময়ে তিনি উইমেন এরাবিক টিচারর্জ কলেজ, উসাও-এর অধ্যক্ষা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে তিনি নিব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানি ডিপার্টমেন্টে গবেষক হিসেবে কাজ করেন। পরবর্তীতে সেখান থেকে মেরিল্যান্ডে স্থানান্তরিত হন। মেরিল্যান্ডে তিনি ধারাবাহিকভাবে লাজনা ইমাইল্লাহ্ সংগঠনের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। আমেরিকার লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র নায়েব সদর হিসেবেও সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। লাজনা ইমাইল্লাহ্ ওয়াশিংটন-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। অত্যন্ত স্নেহশীলা, অন্যের দুঃখকষ্টে সহমর্মী মহিলা ছিলেন। মরহুমা মূসীয়া ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি নিজ স্বামী, চার ভাই ও দুই বোন রেখে যান, তার কোন সন্তানসন্ততি ছিল না। তার এক ভাই আমেরিকার নায়েব আমীর হিসেবে এবং অন্য এক ভাই আমেরিকার দারুল কাযাতে দায়িত্ব পালন করছেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ কানাডা নিবাসী মুহাম্মদ শরীফ সাহেবের স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া সাফিয়া বেগম সাহেবার। ১১ মার্চ তিনি ৮০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি পেশওয়ারের সাবেক মুরুব্বী সিলসিলাহ্ মোহতরম মৌলভী চেরাগ দ্বীন সাহেবের বড় মেয়ে ছিলেন। ওয়াহ্‌কেন্টে দীর্ঘদিন লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্যাভ করেছেন। তার স্বামী ১৯৯৩ সালে একটি দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সন্তানদের উত্তম তরবীয়ত করেছেন। নিয়মিত নামায-রোযায় অভ্যস্ত এবং তাহাজ্জুদ গুজার, ধৈর্যশীলা ও কৃতজ্ঞ মহিলা ছিলেন। খুবই মিশুক, পুণ্যবতী ও সহানুভূতিশীলা ছিলেন। তিনি এক তৃতীয়াংশ ওসীয়্যত করেছিলেন। তিনি তার অবর্তমানে চার মেয়ে ও এক ছেলে রেখে গেছেন। তার সব সন্তানই কোন না কোনভাবে জামা'তের সেবায় নিয়োজিত আছেন। আল্লাহ্ তা'লা এসব মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসূলভ আচরণ করুন এবং তাদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডন কর্তৃক অনুদিত)